ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

মাহমুদুল হকের *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতা

*ড. আবু নোমান মো. আসাদুল্লাহ

সার-সংক্ষেপ: মাহমুদুল হক বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য নাম। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অল্প কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস রচনা করে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতায় বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ছোটগল্প দিয়ে মাহমুদুল হকের সূচনা হলেও খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি উপন্যাস রচনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস অনুর পাঠশালা (১৯৬৭ সাল) মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক বৈষম্যের একটি নমুনা উপন্যাস। বিষয় ভাবনার দিক থেকে মাহমুদুল হক ব্যক্তি ও সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সংস্কার ও ভেদ-বৈষম্য, জীবন সংগ্রাম, রাজনীতি, শোষণ, মূল্যবোধ ও জীবনচেতনার ভাঙচুর প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গকে আশ্রয় করেছেন। প্রবলভাবে আঙ্গিকসচেতন ছিলেন তিনি। অনুর পাঠশালায় তিনি সমাজ বৈষম্য ও মনস্তত্ত্বের একটি ম্যাজিক আবহ নির্মাণ করেছেন। সমাজের দুই শ্রেণির প্রতিনিধিকে নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন স্তরের সমাজের গ্লানি, জীবনযাপন ও ফাঁকফোঁকর স্পর্শ করতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সামাজিক জীবনযাপন, অভ্যন্তরীণ ক্লেদ, ভেদ-বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। একই সাথে দুই শ্রেণির সঙ্গতিসম্পন্ন নাগরিকের জীবনচেতনাবোধের ধারা ও প্রকৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মাহমুদুল হক একজন অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী। তাঁর জন্ম ১৬ নভেম্বর ১৯৪০ সালে। পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের কাজীপাড়ায়। তাঁর বাবা সিরাজুল ইসলাম একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, অর্থবিভাগের উপসচিব। মা মাহমুদা ছিলেন গৃহিণী। ১৯৫০ সালে তাঁর বাবা ঢাকায় চলে আসেন। দশ ভাইবোনের মধ্যে মাহমুদুল হক ছিলেন চতুর্থ। ঢাকায় বড় হয়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক শেষে তিনি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর দৈনিক সংবাদের চাকুরি দিয়েই পেশাগত জীবনের সূচনা। এক পর্যায়ে অনুবাদকের কাজও করেছেন। কিন্তু এ চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি আবারো ব্যবসা শুরু করলেন। এবারে জুয়েলারির ব্যবসা। বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ সে সময়েই। ছোট গল্প দিয়ে সূচনা হলেও বাংলা উপন্যাসের প্রতিই ছিল তাঁর ঝোঁক। যেখানে *খঞ্জনা পাখি* দিয়ে তিনি উপন্যাস রচনার সূচনা করেছিলেন। অবশ্য প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, দ্রৌপদীর আকাশে পাখি ছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস, কিন্তু সেটি হারিয়ে যায়।[১] তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে, *জীবন আমার বোন*, *নিরাপদ তন্দ্রা*, *খেলাঘর*, *কালো বরফ*, *অশরীরী*, *মাটির জাহাজ*। তাঁর প্রথম উপন্যাস *যেখানে খঞ্জনা পাখি* পরবর্তীতে *অনুর পাঠশালা* নামে ছাপা হয়েছে। প্রকাশিত গল্পের মধ্যে রয়েছে, *প্রতিদিন একটি রুমাল*, *মানুষ মানুষ খেলা* ও *মাহমুদুল হকের নির্বাচিত গল্প*। ছোটদের জন্য তাঁর একমাত্র লেখা হলো *চিক্কোর কাবুক* উপন্যাস। ২০০৮ সালের ২১ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সুস্থ থাকা স্বত্ত্বেও এক পর্যায়ে তিনি লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঠিক কী কারণে তিনি লেখা বন্ধ করেছিলেন সে সম্পর্কে কেউই কিছু বলতে পারেন না।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

অনুর পাঠশালা মাহমুদুল হকের সমাজ-সংস্কৃতি বৈষম্যের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের উপন্যাস। কেউ বলেন কাব্যধর্মী, কেউ কাব্যাক্রান্ত। মাহমুদুল হকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস এটি। এর মধ্যে পঞ্চমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে বইটি। প্রথম প্রকাশের সাল ১৯৭৩। তখন এর নাম ছিল *যেখানে খঞ্জনা পাখী*। অবশ্য বইটি লিখিত হয়েছে এরও অনেক আগে। ১৯৬৭ সালের জুলাইয়ে।[২] বাবাকে উৎসর্গ করা হয়েছে বইটি। পরের পৃষ্ঠায় কবিতার পাঁচ লাইনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া। উদ্ধৃতিটি বিনয় মজুমদারের।

> স্বপ্নের আধার, তুমি ভেবে দ্যাখো, অধিকৃত দুজন যমজ
> যদিও হুবহু এক, তবু বহুকাল ধরে সান্নিধ্যে থাকায়
> তাদের পৃথকভাবে চেনা যায়, মানুষেরা চেনায় সক্ষম।
> এই আবিষ্কারবোধ পৃথিবীতে আছে বলে আজ এ সময়ে
> তোমার নিকটে আসি, সমাদর নেই তবু সবিস্ময়ে আসি।[৩]

৯১ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি ১১টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বলে নেয়া ভাল, এ অধ্যায়গুলোর মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ অধ্যায়গুলো একেবারেই সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইনের। এমনকি ৭ম অধ্যায়টি মাত্র এক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপন্যাসের আঙ্গিকগত বিবেচনায় মাহমুদুল হক তাঁর অনুর পাঠশালা নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ততা সে কথাই বলে। বিদ্রোহ কিংবা সাহসিকতা যা-ই বলা হোক না কেন সাহিত্যক্ষেত্রে এটি যে নতুনত্বের স্বাদ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনু এ উপন্যাসের নায়ক। কিশোরবয়সী অনুর বাবা হাইকোর্টের ডাকসাইটে উকিল। মা সংসারের এক অতৃপ্ত নারী। বাবা-মায়ের সম্পর্ক অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতায় ভরা। বাবা খুনি ও পরনারীতে আসক্ত। তাই অনুর মা বাবার সংসার ছেড়ে যেতে চান। স্বাধীনভাবে চাকুরি করার অভিপ্রায়ে সুদর্শন এক যুবক শিক্ষকের কাছে ইংরেজি শিক্ষা করেন বাড়ির উপরতলার নিভৃত এক কক্ষে। সারা দুপুর মা ইংরেজি শিখেন। আগে অনুকে যেমন সময় দিতেন, এখন পারেন না মোটেও। উপন্যাসের শুরুটা ঠিক এভাবে-

> দুপুরে অনু একা থাকতে পারে না, ভেবে পায় না কী করবে কোথায় যাবে। ঘরের সবগুলো দেয়ালের চেহারা ও হাবভাব আগেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; থমকানো এবং শাদা ভয়ের ছাপ মারা এমন সব অনড় আয়না যাতে কখনো কারো প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না। বাঞ্ছারামপুরের থানে মোড়া রানি ফুফুর কথা মনে হয়; এক ফুৎকারে নিভে যাওয়া নির্বিকার মোমবাতি, ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হাসে।[৪]

অনুদের বিশাল বাড়ির পাশে বস্তি। সেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষের বাস। তাই অনুর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু অনুর মন টেকে না ঘরের ভেতর। ছটফট করে বেরিয়ে আসতে। উপন্যাসে যেভাবে বলা হয়েছে, "গরম হাওয়ার হলকা চোখে ছোবল মারে বলে এই সময় জানালায় দাঁড়ালেও অনুর তেমন ভালো লাগে না। ঝিমিয়ে পড়া ওলবড়ি গাছ, ঝলসানো কাক, ঘুঘু ও অন্যান্য পাখির ডাক, তপ্ত হা হা হাওয়া। সবকিছু গনগনে উনুনে পোড়া রুটির মতো চিমসে গন্ধে ভরিয়ে রাখে। লামাদের বাগানে বাতাবি লেবুর ঝোপের পাশে আচ্ছন্ন ছায়ার পাড়া-বেপাড়ার দস্যুরা পাঁচিল ডিঙিয়ে এ সময় ব্রিং খেলে, জানালায় দাঁড়ালেই সব দেখা যায়।[৫]" এরপর বস্তিতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে যায় তার বর্ণনা:

> খুচরো খুচরো ঝগড়া, আলগা মারপিট এইসব শুরু হয় এক এক সময়। ...দিনের পর দিন সবকিছু প্রায় ধরাবাঁধা নিয়মে নির্বিবাদে চলতে থাকে। ...দেখা যায় লামাদের বাগানের জলেশ্বর মালী ও মালীবৌকে। বাগানের দক্ষিণ কোণে তাদের বাঁশের একচালা ঘর। ...সাধারণত ভরা হাঁ হাঁ নির্জন দুপুরে আলগা বুকপিঠে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে দুজন। ...মালীবৌয়ের বুক শাদা ধবধবে।[৬]

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা অনুর মনে হয় ওদের ঘরটি কী প্রশান্ত, ঠাণ্ডা-কুলকুলে। গাল পেতে শুয়ে থাকা যায়। অগোচরে বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়।

ছাদে যেতে অনুর ইচ্ছে হয়। সেখানেও বাধা। লামাদের এত সুন্দর বাগানে বাগানে যেতে পারে না অনু; বারণ। মনটায় তার তীব্র দহন, যন্ত্রণাক্রান্ত। ঐগুলো অনুর পছন্দের বিষয়। অথচ মা বলেছেন, "ঐসব হাঘরে ইতরদের সঙ্গে তোর অনেক তফাৎ। ...তোর সবকিছু সাজে না। ভালো না লাগলে রেকর্ড বাজিয়ে শুনবি। ছবি আঁকা আছে, গল্পের বই পড়া আছে, ঘরে বসে যা ইচ্ছে করতে পারিস, কেবল টো টো করে ঘোরা চলবে না।[৭]" এই পরিস্থিতিতে অনুর কিশোর হয়ে ওঠার গল্প।

> এক সময় সারাদিন মেকানো নিয়ে পড়ে থাকতো অনু। মেকানোর পর টিকিটের এলবাম। ডাকটিকিটের পর এলো বই পড়ার নেশা। তারপর ছবি আঁকা। আফ্রিকার জঙ্গলে অভিশপ্ত মমি। মিশমীদের কবচ খুবই প্রিয় এগুলো একসময় খুবই প্রিয় বই ছিল। এখন ভালো লাগে আম আটির ভেঁপু অর্থাৎ কিশোর রোমান্টিক। বালিশ ভিজে যায়।[৮]

বাবা-মা দুজন তাঁদের নিজস্ব ভুবনের বাসিন্দা। এদিকে অনু একা বাড়িতে বন্দি জীবনের এক তীব্র যাতনা-ঘৃণা নিয়ে বেড়ে উঠছে। তার নিজের কাছে মনে হয়, সে একটা মস্ত বাড়ির খোলের মধ্যে বন্দি। ১৮/১৯টা ঘর নিয়ে পুরনো বিশাল দোতলা এই বাড়ির ছাদ এত উঁচু মনে হয় যেন এর উপরে কোনো আকাশ নেই। নিঃশব্দ এই বাড়ির ভেতরে সবাই একা একা। মায়ের জগত হচ্ছে বাড়ি সাজানো এবং একুরিয়ামের মধ্যে নিজের ভেতরের তীব্র ইচ্ছেগুলো না পাওয়ার বেদনায় এক সময় ধীরে ধীরে ফ্রিজের ঠাণ্ডা বোতলের মতো ঘেমে ওঠে, "গুমরে উঠতে থাকে অনু-মা কোনো এক মরা নদী। ইচ্ছেরা সব জলেশ্বর মালী। ইচ্ছেরা সব এক একটা চন্দনের পুরানো কৌটো।[৯]"

অনুর মা বাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন। একই ধরনের সৌন্দর্য মনকে সবসময় আলোড়িত করে না। মা সে কথায় একশ' ভাগ বিশ্বাসী। একুরিয়ামগুলোয় নিত্য নতুন বিচিত্র মাছের প্রয়োজন। আগের মতো মেথিলিন ব্লুতে মাছগুলোকে নিয়মিত চোবানো হয় না।

অনু তার বাবাকে সহ্য করতে পারে না। ভাবে শয়তান একটা। প্রথমে ভয় করতো বাবাকে, এখন ঘৃণা। এখন বাবাকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে অনুর বাবা তার মাকে এসে বলে, আজ খুনের আসামিকে বেকসুর খালাস করিয়ে এলুম। এই খুনি বাবাকে তার ঘৃণা।

অনুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে রুচিও পরিবর্তন হতে লাগল। এই বড় হওয়া ও রুচির স্বাদ বদলানো মাহমুদুল হক ২ থেকে ৭ অধ্যায়ে কয়েক লাইনে স্পষ্ট করেছেন।

> দুপুরে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে অনু। স্বপ্ন দেখল লামাদের বাগানে আমগাছের মগডালে পা ঝুলিয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরা মা। গলার উপর থেকে কেটে বাদ দেয়া, সেখানে একটা কাস্তে। ...সে দাঁড়িয়েছিল গাছের ঠিক নিচে। ওপর থেকে মা তার গায়ে থুথু করে থুতু দিল। দাউ দাউ করে শরীরে আগুন ধরে দমকা হাওয়া। হৈহল্লা হেহল্লা হৈহল্লা।[১০]

উপন্যাসের জন্য কাহিনি অপরিহার্য। *অনুর পাঠশালায়* যে কাহিনি সেটি উচ্চমধ্যবিত্তের বৈভবের মিথ্যে দাপট এবং নিম্নবিত্ত অনার্যের ক্ষয়িষ্ণুতার আলেখ্য। এর মাঝে উঠে এসেছে উচ্চমধ্যবিত্তের ভড়ংপনা-হ্যাংলামি এবং নিম্নবিত্তের আত্মমর্যাদার এক সূক্ষ্ম-সৌকর্য পর্দার আবরণ। এই কাহিনির গভীরতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহবান লেখকের। "কোনো একদিন ঝনঝনে থালার মতো দুপুরে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে একটা পাখি দারুণ চিৎকার করে উঠল। কানে বাজল, এসো অনু এসো।[১১]"

অনু বেরিয়ে পড়ল মাকে লুকিয়ে। বস্তির শিশু-কিশোরদের সাথে তার মেলামেশা শুরু হলো। ওদের কারো নাম ফকিরা, কারো নাম টোকানি, গেনদু, লাটু, ফালানি, মিয়াচাঁন এবং আরো অনেক। অনু তার মার্বেলগুলো তাদের দেয়। ভাব-ভালোবাসা তৈরি হয়। কিন্তু রুচিতে তাদের পার্থক্য-ভেদ-বিভেদ থাকেই। মাহমুদুল হক এই বিভেদকেও এঁকেছেন তাঁর কাব্যিক এক অসাধারণ কুশলতায়।

> মিয়াচাঁন চিকন চিকন গলায় গান জুড়লো-
> নাকে নোলক কানে ঝুমকা
> মাইয়া একখান বড়ে
> নদর গদর চলে মাইয়া
> ফুশুর-ফাশুর রড়ে।
> গেনদু বাধা দিয়ে বললে, আব্বাস উদ্দিনের গীত গানা বে, রেকর্ডের গীত ছাড়া অনু হালায় বুঝবার পারব না। এই হালারে লইয়া মুশিবত বাইধাই রইছে।[১২]

গেনদু অনুর হাত চেপে ধরে অনুনয় করে বললে, 'খিলাইয়া নিহি বন্দু'। অনু তাদের দাবি পূরণ করে। একসময় কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েদের অন্তর্বাস নিয়ে উল্লাস শুরু করে তারা। কী সহজ সরল উপস্থাপনা।"হি হি করে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে ধরে বললে, 'এলাগ ছেরিগ দুদে বান্দনের জামা। আয়না মিয়াচাঁন তরে লাগায়া দেহি।[১৩]"

এভাবেই উচ্চমধ্যবিত্তের শুচিতাবোধের আবহে বেড়ে ওঠা কিশোর অনু নিম্নশ্রেণির ভেতরে থাকা সহজাত খিস্তি-খেউড়, যৌনতা ও হাস্য-কৌতুকের মুখোমুখি হয়।

এর মধ্যে চামারপাড়ার কিশোরি সরুদাসীর সাথে পরিচয় হয় অনুর। সরুদাসী পেয়রা খেতে খেতে এই ছেলেদের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। গেনদু ও মিয়াচাঁন ওর হাত থেকে পেয়ারা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালায়। সরুদাসী তাদের দিকে ঢিল ছুঁড়ে গালাগালি দিতে থাকে এবং কাঁদতে থাকে। অনুর সামনেই ঘটল এমন ঘটনা। অনু পেয়ারা কিনে দিতে চাইলে সরুদাসী খুশি হলো। পেয়ারা না পেলে মিছরি হলেও চলবে বলে জানাল।

সরুদাসীকে এই উপন্যাসের নায়িকা বলা যেতে পারে। তার বাবা মুচি, মা ধাইগিরি করে। বয়সে প্রায় তুল্য হলেও অত্যন্ত বাকপটু ও যৌনতা বিষয়ে বেশ পাকা। বোঝা যায় এ জ্ঞান পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। সে একটির পর একটি অশ্লীল কথা বলতে থাকে অবলীলায়। অনু অনেক সময় চুপ করে থাকে। সরুদাসীর কাছে তাকে অনেক অনভিজ্ঞ ও বোকা মনে হয়। মিছরি কিনতে গিয়ে সে অনুকে সাবধান করে যেন দেখে নেয়। কিনে আনলে বলে, দোকানদার রতিরঞ্জন পসারী তাকে বেছে বেছে খারাপ মিছরি দিয়েছে। দোকানদারের সততা সম্পর্কে তার মন্তব্য হচ্ছে-

> ভাল বাছতে পারিসনিরে, হুঁশো পেয়ে ঠকিয়ে দিয়েছে। আমি যদি হতুম তাহলে আর ফাঁকিবাজি চলতো না। ...বেহায়ার রাজা আশপাশের ধুমসী চাকরানি ছুঁড়িগুলোর মাথা ওই তো খাচ্ছে। জামা তুলে গা দেখালে দুটো বাতাসা, গায়ে হাত দিতে দিলে তেল সাবান, কম নচ্ছার ওটা। ...আমার কাছে কিন্তু পাত্তা পায় না, হু। আমাকে কি বলে জানিস? বলে তুই এখনো এক বাতাসা, দু বাতাসার যুগ্যি হসনি।[১৪]

সরুদাসীর এই সব কথা অনু মগ্ন হয়ে শোনে ও ভাবতে থাকে। সরুদাসী অনুর সুন্দর মুখশ্রী ও চালচলনকে পছন্দ করে। বলে, "তুই ওইসব হা ঘরে ছোটলোক ছেলেদের সাথে খুব মাখামাখি করিস, নারে? কুটোকাটাগুলো সব পচা জাতের, তোর ঘেন্না করে না? তুই কত ভালো! কত সুন্দর! আমি যদি তোর মতো হতে পাত্তাম।[১৫]"

অনুর ভালো লাগে সরুদাসীকে। সরুদাসীর কথা বলার ধরন, পাকা গিন্নির মতো আচরণ আর ঝকঝকে দাঁতগুলো। সরুদাসীর প্রশংসায় অনুর নিজের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে ওঠে। এক সময় মিশুক অনু বলে, 'আমি ঘেন্না করি ওদের। ওরা লোভী হ্যাংলা।'

সরুদাসী আশেপাশের পাড়ার অনেক গোপন খবর রাখে। সেগুলো সে অনুকে শোনায়। "চারমান বাবুর ছোট মেয়েটার না বিয়ে হতেই পেট হয়েছে। ...মাকে বলে কিনা পেট ফেলে দিতে পারলে পঁচিশ টাকা দেবে। ...ইশ কী উঁচু নাকই না ছিল ছুঁড়িটার।"[১৬] কথা বলতে বলতে এক সময় বৃষ্টি শুরু হয়। দৌড়ে তারা একটি দোকানের ঝাঁপ ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। দোকানের ভেতরে কেউ নেই। সরু আর অনু। সরু অনেক কথা বলতে থাকে। অনু কখনো কখনো বিব্রত হয়। আবার মজাও পায়। যেমন,

> সরুদাসীর পরণে শাড়িছেঁড়া ফালি লুঙ্গির মত জড়ানো। গায়ে ঘটির মতো ফোলাহাতা ছিটের ব্লাউস, যার একটাও বোতাম নেই। নাভির উপরে গিট মারা। কোমরে কড়ি বাঁধা লাল ঘুনসি। ভিজে কাপড়ে ছুটতে গিয়ে পিছনের দিকে খানিকটা ফেঁসে গিয়েছিল। সরুদাসী ছেঁড়া জায়গায় হাত রেখে হঠাৎ কালো করে তিরস্কারের সুরে বললে, তুই কী অসভ্যরে, হাঁ করে আমার পাছা দেখছিলি বুঝি এতক্ষণ?[১৭]

সরুদাসীর খেলার সাথী বিশুয়ালাল, হরিয়া। তাদের কথা অনুকে শোনায় সে। হরিয়া তার সাথে কী গুণ্ডামি করে তা-ও সে বলে অনুকে। সরু আরো বলে,

> তোকে সব শিখিয়ে দেব। বাবুদের বাগানে কাঁটামুদি আর ভাঁটঝোপের ভেতর আমার খেলাঘর পাতা আছে, সেখানে তোতে আমাতে মাগ ভাতার খেলা খেলবো। আমি মিছামিছি চান সেরে ন্যাংটো হয়ে কাপড় বদলাব, তুই চোখ বন্ধ করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবি। ...তুই মিথ্যে মিথ্যে রাগ করবি। বলবি, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা হলো সেদিকে খেয়াল হলো নাছার মাগীর, মাই দিতে পারিস না, এইসব। ...খেয়েদেয়ে দুজনে

> পাশাপাশি শোবো। তুই রাগ করে চলে যাবি। তারপর মিছিমিছি তাড়ি খেয়ে মাতলামি কত্তে কত্তে এসে আমাকে রানডি মাগী ছেনাল মাগী বলে যাচ্ছেতাই গাল পাড়বি।[১৮]

অনু বকাবকি করতে রাজি হয় না। তখন সরু বলে, "দুর বোকা খিস্তি-বিখিস্তি না করলে মেরে গতর চুরিয়ে না দিলে তোর মাগি ঠিক থাকবে নাকি? ভাতারের কিল না খেলে মাগীরা যে নাঙ ধরে তা-ও জানিস না বুঝি?[১৯]"

অনু শোনে সবকিছু হাবার মতো। অনর্গল কথা বলা সরু নিজেই আশ্চর্য রূপময় এক জগত যেন। অনুর কাছে সরুর গল্প বলার ভঙ্গি, হাত-পা নাড়া, ঠোঁট উল্টানো, চোখ বড় বড় করে তাকানো সবকিছুর সঙ্গেই কোমলতা জড়িয়ে আছে। এক সময় অনুর বাকপটু বানি ফুফুর সাথে তুলনা করে সরুদাসীর।

সরুদাসীর বাবা মুচি। মুচি পেশার উপর অগাধ শ্রদ্ধা তার। জুতো সেলাই প্রসঙ্গে সরুর মত হচ্ছে,

> কটা লোক ঠিকমতো জুতো শেলাই কত্তে পারে? ...শ্রীনাথ জ্যাঠাতো সকলের মুখের ওপর পষ্ট করেই বলে। বলে, কাজের কী জানিস তোরা, ফাঁকি মেরে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে কাজ করছিস, একে জুতো শেলাই বলে না, গোঁজামিলের কাজ, জোচ্চুরি করে পয়সা নিচ্ছিস, জুতো শেলাই অত সহজ নয়। ...সব কাজই কঠিন, তাকে ভালোবাসতে হয়, নিজের মাগি করতে হয়, মাগি করলি তো ধরা দিলো, তোর যে মাগি সে তোরই জানা। পায়ের জুতো পায়েই থাকবে মাথায় উঠবে না কখনো-স্রেফ গোঁজামিল দিয়ে চালা, এই যদি তোর মনের কথা হয়, তাহলে শিখবিটা কেমন করে। পায়ের সেবা করলেই মাথা পাবি, মাথার মধ্যেই সব, মাথার মধ্যে বিশ্ব।[২০]

কথাগুলোয় সরুদাসীর একধরনের চরিত্র ফুটে ওঠে। কথাগুলো সে বললেও এর অর্থ সে নিজেই জানে না। একসময় সে অনুকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বিশ্ব মানে কীরে? প্রত্যেক মানুষই তার সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার সহযাত্রী। সরুদাসীও বিচ্ছিন্ন নয়। তার পূর্বপুরুষের পেশা জুতো শেলাইয়ের কিংবা মায়ের ধাই পেশার প্রতি তার যে অকপট শ্রদ্ধাবোধ তা-ও এ পাঠশালার-ই শিক্ষা।

বাকপটু সরু কথা বলার এক পর্যায়ে অনু তাকে বিয়ে করতে রাজী কিনা জানতে চায়। অনু বিব্রত হয়, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তখন সরু বলে, "...আমরা তো আর বাবুজাতের মেয়েদের মতো চোখকানের মাথা খেয়ে বেহায়াপনা কত্তে পারিনে। বুক উইটিবির মতো উঁচু করে পাছা দুলিয়ে রঙ-চঙ মেখে অন্যদের বোকা বানিয়ে মন ভাঙানো আমাদের ভেতরে নেই বাপু। আমরা যা তাই![২১]" এক পর্যায়ে সরুদাসী দোকানের ভেতরে চৌকিতে পাশাপাশি গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকার প্রস্তাব দিলে অনু বলে আজ থাক আর একদিন হবে। ভয় করছে কিনা সরুদাসী জানতে চাইলে অনু বলে, তার গায়ে আঁশটে গন্ধ এবং নোংরা।

সরুদাসী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে। ঝগড়া বাধায় অনুর সঙ্গে। বৃষ্টির মধ্যে চেলাকাঠ নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে তাড়া করে। বাড়ি ফিরে আসে অনু। জ্বরে পড়ে কিছুদিন। আবার বের হয় বস্তির বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। গেনদু-মিয়াচাঁনদের সাথে দেখা হয়। তাদের সাহচর্য আগের মতো চমৎকৃত করে না। তাদের বিভিন্ন ধরনের গল্পে সে আকৃষ্ট হয় না আগের মতো। "ওরা

এক একজন একে অপরকে আড়াল করে ঝোপঝাড়ের নিচে, মাটিতে কোথাও ঘুঘুতে ডিম পেড়েছে কিনা খুঁজতে বের হয়, মোহরের ঘড়া পাওয়া যাবে এই আশায়। নিচে মোহরের ঘড়া না থাকলে ঘুঘু কখনো মাটিতে ডিম পাড়ে না ওরা তা জানে; তলে তলে ভাগ্যকে বদলাতে সকলেই উদগ্রীব।[২২]"

উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য সম্ভবত এখানেই বেশি টের পাওয়া যায়।

টোকানির নির্মম দারিদ্র্য দেখে অনু সহানুভূতিশীল হয়ে সাহায্য করে। সরুদাসীকে মনে মনে খুঁজতে থাকে, পায় না। সরুদাসীর মান ভাঙাতে ইচ্ছে করে অনুর। চামারপাড়া সেও তো কোথায়-জানা নেই অনুর। ভয়ও করে।

সমাজে সকলের নিজ নিজ পছন্দ অপছন্দ রয়েছে। এটি কখনো আরোপিত নয়- যেমন সত্য তেমনি কিছু বিষয় কমন বিবেকবিরুদ্ধ এবং পালনকালে অন্যের স্বার্থের ক্ষতিও হয়। কিন্তু কে তা ভাবে? মাহমুদুল হকের এই উপন্যাসে অনুর বাবা-মায়ের চরম দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ এবং কলহের বিষয়টি এসেছে। কোনো বিষয়ে একে অপরের মতকে সামান্য ছাড় দিতে চায় না। উচ্চমধ্যবিত্তের এটি চিরন্তন দ্বন্দ্বের নমুনা বলা যায়। অনুর বাণী খালা ও তার ছেলে-মেয়ে মন্টু-মঞ্জু-গোর্কি একদিন অনুদের বাসায় বেড়াতে আসে। অনুর সাথে তাদের পছন্দ-অপছন্দ ও রুচিবোধের পার্থক্য লেখক তুলে ধরেছেন এই অংশে। উচ্চমধ্যবিত্তের ঘেরাটোপে বসবাস করেও তার খালাতো ভাই-বোনদের রুচিবোধের সাথে অনুর রুচির বিস্তর ফারাক। মন্টু-মঞ্জু-গোর্কি যেখানে সিডি-পপ-বিটল, টিভি ইত্যাদি বিনোদনে আকণ্ঠমান, অনু তখন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিচরণে সাবলীল-স্বাচ্ছন্দ্য। বাণী খালাও নিজ আভিজাত্য ও বিদেশ ভ্রমণের বড়লোকি গল্প প্রচারে ব্যস্ত। সেখানেও এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। 'শুধুমাত্র ইস্ত্রি করা দামি কাপড়ের মড়মড়ে ভাঁজ অতিকষ্টে বজায় রাখার জন্যেই ওরা এই পৃথিবীতে এসেছে।'[২৩] অনুর বাবা বাণী খালাকে তার উকিল জীবনের বিচিত্র গল্প শোনাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মা'য়ের উষ্মা প্রকাশ ও তা ধীরে ধীরে ঝগড়ায় রূপ নিল। বাণী খালা চলে গেলেন। খালা চলে যাবার পর অনুর বাবা তার বিধবা বোন রানি ফুফুকে ঢাকায় নিজের কাছে নিয়ে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। অনুর মা এতে আপত্তি জানিয়ে অশ্লীল কিছু কথা বললেন। এর আগে তাকে ডেকেও আসে নি এখন কেন আসতে চায়? জিজ্ঞাসা অনুর মায়ের। বাবা যুক্তি দিলেন, এর আগে তার মনের শক্তি ছিল একা থাকতে পারবে সাহস ছিল। এখন হয়তো নেই। কিন্তু অনুর মা'র ধারণা, মনের জোর নয়, এতদিন রূপের বহর ছিল, রূপের দেমাগ ছিল, বরং সে সময় আসলে ওর অসুবিধাই হতো। এখন ও সবে ভাটা পড়েছে। '...আর ও নচ্ছার মাগিও কম যায় না, থেকে থেকে যেন চাগিয়ে উঠছে।'[২৪]

বাবা-মা'র ঝগড়া দেখতে থাকে অনু। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মা'র ড্রেসিং টেবিল হতে ক্রিস্টলের একটা ভারি শিশি হাতে বাবার কপালে ছুঁড়ে মারল। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ল। 'দুহাতে অনুকে আগলে রাখল মা। বাবা অনুকে দেখলেন, ক্রুদ্ধ কিংবা দুঃখিত, অনু তাকাতে পারল না।'[২৫]

অনুর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াগুলো উপন্যাসের এই অংশ থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। কাব্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক।

অনুর পাঠশালার গল্প ও ভাষা নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসের গল্পের মধ্যে সুস্থির ভাব নেই, কিংবা অতৃপ্তিকর বলে কেউ কেউ সমালোচনা করলেও ভাষা সম্পর্কে সকলেই উঁচু ধারণা পোষণ করেছেন। সনৎকুমার সাহা এ উপন্যাস নিয়ে বিস্তর আলোচনার এক পর্যায়ে বলেছেন, (ঘটনাপ্রবাহে অতৃপ্তির যন্ত্রণা থাকলেও...) "অথচ ভাষার কী জাদুকরি মায়া! বিষয়ের ইন্দ্রজাল ফুটে ওঠে ঐ ভাষায়। পরিশীলিত, কিন্তু মনে হয় না আরোপিত। বাস্তবের নির্যাস যেন প্রতিটি কথায় পুরে দেওয়া। বর্ণময়। প্রাণময়। তবু ছবি। জীবনের অনুভবের ছবি।"[২৬] মনে হয় সমালোচক এমন মায়াময় কাব্যিক উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে নিজেই মায়ার জাদুতে বন্দি হয়ে কাব্যাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অনুর মনের মধ্যে তোলপাড় ঝড়ধ্বনি। নিসাড় হয়ে পড়েছিল, মাথা তুলতে কিংবা চোখ খুলতে পারেনি। পারেনি রাত-দিনের ব্যবধান পর্যন্ত অনুধাবন করতে। জ্বর গায়ে ঘুমঘোরে স্বপ্নে আইনস্টাইনকে খুঁজে বেড়িয়েছে পৃথিবীময় পাগলের মতো। মাথার মধ্যে সুপ্ত অবিস্তৃত চিন্তাগুলো পাখা মেলেছে স্বপ্নের মধ্যে। কখনো আইনস্টাইনকে খুঁজছে অনু, কখনো লামার মৃত মামার সঙ্গে দেখা হলো। আইনস্টাইনের কাছে অনু পৃথিবীর মাস্তুলের খোঁজ জানতে চাচ্ছে। আইনস্টাইন বললেন,

> সর্বনাশ, তার গায়ে যে টাটকা রক্ত! ধূর্ত কাকের ঝাঁক মাস্তুলের উপর বসে, মানে মাস্তুলের উপর বসে আহার সন্ধান করছে। তোমার একজোড়া নৌকায় সূর্যের ডিম দু'টি ঠুকরে ঠুকরে খাবে, অন্ধ হয়ো না। ...এইমাত্র ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আইনস্টাইনকে ঘোষণা করে দাও বজ্রাঘাত হানো! এইমাত্র ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আইনস্টাইনকে ঘোষণা করে দাও, দাবানল জ্বালো!" ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, ওগো দয়া করো, ওগো দয়া করো; এদের কোনো ধর্ম দীর্ঘনিশ্বাস বলে আজো আমায় ডাকল না।[২৭]

কখনো সরুদাসীকে দেখল অনু, সেই ঝরঝর বৃষ্টি, দোকানের ঝাঁপতাল, গন্ধ, বাবার গল্পের বিষয়, আইফেল টাওয়ার স্বপ্নের মধ্যে বিক্ষিপ্ত রঙছটায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন লেখক। যেন পাঠকও স্বপ্ন দেখছে। অনেকেই বলেন কাব্যিক বা কাব্যাক্রান্ত অথবা মনস্তাত্ত্বিক। আসলে এখানেই মাহমুদুল হক অনন্য-অসাধারণ।

সরুদাসী কি অনুর কাল্পনিক নায়িকা? এ প্রশ্ন চলে আসে লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে। অথবা এমনও হতে পারে লেখকের শিশুমন অতিক্রান্ত সময়ের স্রোতে প্রবাহিত হয়নি এরপর। লেখক বারবার ফিরে যাচ্ছেন শিশুসময়ের বর্ণিল কষ্টের দিনগুলোর মাঝে। সরুদাসীকে খুঁজে বের করতেই হবে অনুর এ প্রত্যয় কি শুধুই কল্পনা? এখানেও লেখক এক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার অবতারণা করেছেন। ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে অনু। মানসিকভাবে তো বটেই।

> অসুখের পর থেকে নিজের বদল দেখে নিজেই চমকে যাচ্ছে। নিজের কাছেই কত অচেনা এখন। মা কোনোদিন পালাতে পারবে না এ বাড়ি ছেড়ে, সবই মিথ্যে প্রবোধ ছিল এতদিন। তাকে পালাতে হবে একাই। আর সেই জন্যই কপাল খুঁড়ে, পৃথিবী খুঁড়ে, আলো নিংড়ে নিংড়ে যেমন করেই হোক সরুদাসীকে তার খুঁজে বের করা চাই-ই।[২৮]

কিশোর বয়সে দেখা সরুদাসীকে খুঁজতে বের হয়েছে অনু। চেনা পথের স্মৃতি তাকে অনেকটা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত করল। "স্পষ্ট মনে আছে অনুর ঝাঁপ ঠেলে ঢুকবার সময় এই গাছটা পলকের জন্য তার চোখে পড়েছিল সেদিন, কিন্তু ঢেউটিনের ছাউনি দেওয়া সেই চালাঘর

দোকানটা কোথাও খুঁজে পেল না সে।[২৯]" শেষমেষ একটি ছেলে সরুদাসীকে চিনিয়ে দেবে বলে এগিয়ে আসল। কিন্তু এ কোন সরুদাসী? দীর্ঘ সময় খুঁজতে থাকা সরুদাসীর যে অবয়ব অনুর কল্পনায় খেলা করছিল এ যে সে সরুদাসী নয়। "উঠোনের একপাশে ইন্দারার খুব কাছাকাছি হাড্ডিচর্মসার এক বুড়ি খুদ কাঁড়িয়ে কাঁকর আলাদা করছে; শনের নুড়ির মতো চুল, একটাও দাঁত নেই, আর ঘরের বারান্দায় একজন শীর্ণকায় থুত্থুড়ো বুড়ো শাদা ধবধবে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বিভোর হয়ে একমনে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে। ... ছেলেটা বললে, এই তো সরু চামারনী![৩০]" আর হরিয়া সেই শিশুকালের সরুদাসীর সঙ্গে গুণ্ডামি করে বেড়াতো যে সেই এখন তার স্বামী। তার পাশে ঝাঁকড়া শাদা চুলের ঐ শীর্ণ বৃদ্ধই হরিয়া।

উপন্যাস এখানে শেষ হলেও যেন চিন্তার শুরু হয়ে গেল পাঠকের এখান থেকেই। এ কী করে সম্ভব! লেখক কী বোঝাতে চাইলেন? এর কি জবাব আছে। স্বয়ং লেখক এর জবাব স্পষ্ট করেন নি। সম্ভবও নয়। তবে উপন্যাসের শুরুতে বিনয় মজুমদারের সেই কবিতার উদ্ধৃত পাঁচটি লাইন যেন মূর্ত হয়ে গেল।

মাহমুদুল হক সরুকে নিয়ে যে মায়াজগৎ নির্মাণ করেছেন তা অনুমিত হয়। তবে কিশোরি সরুদাসী না বৃদ্ধা? কোনটি মায়া এ প্রশ্ন চলতে থাকবে চিরদিন। হয়তো লেখক এ প্রশ্নের অবতারণাই করতে চেয়েছেন। বিমূর্ত ভাবনার সন্নিবেশন। কিন্তু এগুলো প্রকৃতি থেকে জীবন থেকে প্রত্যক্ষ অর্জন। চারপাশে অসংখ্য ঘটনার হলাহল কোলাহলের মাঝে নায়ক কিশোর অনু এক নিঃসঙ্গ ভাবনার পথিক।

এটি কি শুধুই মুগ্ধতা? শুধুই শিল্পের জন্য শিল্প? মাহমুদুল হক এ প্রশ্নকে দাঁড় করিয়েছেন সভ্য সমাজের বিবেক বরাবর। ধনী-দরিদ্রের পোশাকি ও চিন্তার যে পার্থক্য মাহমুদুল হক স্বভাবসুলভ অঙ্কন করেছেন তাকে আমরা কী বলব?

কী সংলাপ, কী ঘটনা পরম্পরা, আবেশ-আবহ নির্মিতি সবখানেই অকৃত্রিম এক হৃদ্যতার ছোঁয়া উপন্যাসের ভাষাকে করেছে দুর্নিবার। সমাজের উচ্চ-নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে যেমন বৈপরীত্য তেমনি একই শ্রেণির মানুষের মধ্যেও ভিন্নতা।[৩১] পছন্দে, রুচিশীলতায়। বানী খালার সন্তানদের সাথে অনুর মানসিকতার ভিন্নতা, গেনদু, মিয়াচাঁন টোকানির সাথে সরুদাসীর মানসিকতার ভিন্নতা সমাজে যেন এক বৈচিত্র্যেরই সন্নিবেশন। এ সমাজ, মানুষ, বৈপরীত্য-বৈচিত্র্য, শ্রেণি-মানুষ-ব্যক্তির বৈপরীত্যে চাওয়া-পাওয়ার ভিন্নতা এই-ই অনুর পাঠশালা, শিক্ষালয়।[৩২]

একই সঙ্গে শিল্প, স্বপ্ন, কল্পনা, মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতার সমন্বয় এবং দায়বদ্ধতা সম্ভবত খুব বেশি লেখকের লেখায় আমরা দেখতে পাই না। সম্ভবও নয়। মাহমুদুল হক এ জন্যই অনন্য। সমাজকে নিয়ে শিল্পের যে গভীরতায় পৌঁছানো যায়, মনোজগতের দেয়াল স্পর্শ করে লক্ষ্যের সান্নিধ্যে পৌঁছানো সম্ভব তা বোধ হয় মাহমুদুল হক-ই প্রমাণ করলেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কিংবা হাসান আজিজুল হক যে দৃশ্যকে চপেটাঘাতে বজ্রপাত তুলেছেন, মাহমুদুল হক সেখানে পাপড়ির সুষমায় রাঙিয়েছেন কুয়াশাধূসর ফেননীভ এক ধবল আস্তরণে। ভাষার মুগ্ধতা, চিত্রকল্প, কাব্যসমৃদ্ধি, ভাষার নির্মিতি-ভাঙা-গড়া ও বর্ণিলতা মাহমুদুল হকের লেখার বৈশিষ্ট্য। অনুর পাঠশালা তার-ই এক সুসমন্বয়।

তথ্যসূচিঃ

---

[১] আশরাফ উদ্‌দীন আহমদ (২০১৮), "মাহমুদুল হকের কালো বরফ", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৯ জুন, ২০১৮

[২] ইরাবান বসুরায়, "মাহমুদুল হকের উপন্যাস: দক্ষ শিল্পীর উদাসীনতা", *গল্পকথা* (মাহমুদুল হক সংখ্যা), চন্দন আনোয়ার, সম্পা., বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, রাজশাহী) পৃ. ৯৯

[৩] মাহমুদুল হক, *অনুর পাঠশালা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. উৎসর্গপত্র

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[২৬] ওয়েবসাইট, অদিতি ফাল্গুনী; *আর্টস* bdnews.com/?1766

[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[২৮] মাহমুদুল হক, *অনুর পাঠশালা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৮৫

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

[৩১] ওয়েবসাইট, অদিতি ফাল্গুনী; *আর্টস* bdnews.com/?1766

[৩২] আবু নোমান, "মাহমুদুল হকের অনুর পাঠশালা: কুয়াশাধূসর সকালের কাব্য" *কালি ও কলম*, ষোড়শ বর্ষ, সংখ্যা সপ্তম, ভাদ্র ১৪২৬, পৃ. ২৬